যুগান্তর

তারিখ 03 MAR 2014

এ কে এম শাহনাওয়াজ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে সরকার

জাতির জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞান সৃষ্টির প্রধান জায়গা বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গুরুত্ব বেশি। কিন্তু নষ্ট রাজনীতির অপঘাতে আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিপন্ন দশা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খাবি খাচ্ছে দলীয় ছাত্র রাজনীতি আর শিক্ষক রাজনীতির খপ্পরে পড়ে। অফিসার সমিতি, কর্মচারী সমিতি আর কর্মচারী ইউনিয়ন সবকিছুতেই রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পেশাজীবী সংগঠন রাজনীতিমুক্ত হবে এমনটা ভাবে না কেউ। কিন্তু এসব সংগঠন যখন জাতীয় রাজনীতির মূল দলের ইচ্ছে পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয় তখন ঘটতে থাকে বিপত্তি। এসবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি সবাই। রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা দলগুলোর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর খবরদারি মানাটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সংকট তৈরি হয়েছে অন্য জায়গায়। দলীয় ভিসি ও অন্য ক্ষমতাধররা নিজেদের অবস্থানকে শক্ত রাখার জন্য মেধা বিবেচনার বদলে দল বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ দিতে থাকেন। ফলে উজ্জ্বল শস্যের পাশাপাশি অনেক পচা শামুকও ঢুকে পড়ে। এরা পরবর্তী ৩০-৩৫ বছর সংকটাপন্ন করে তোলেন শিক্ষা-পরিবেশকে। সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিক্ষার্থীরা। অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে গবেষণার পরিবেশ।

আওয়ামী লীগে ভাঙনের পথ ধরে এক সময় ছাত্রলীগেও ভাঙন এসেছিল। মুক্তিযুদ্ধবাদী আর জাসদ ছাত্রলীগের বৈরিতা দেখেছি আমরা। এভাবে চারা বাড়তে থাকে। ছাত্র সন্ত্রাসের রাজনীতি জায়গা করে নিতে থাকে ক্যাম্পাসে। প্রগতিশীল রাজনীতির ধারা এগিয়ে নিতে থাকে বরাবরের মতো ছাত্র ইউনিয়ন এবং পরে তৈরি হওয়া অন্যান্য বামফ্রন্ট। এ পর্যায়ে ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে যার যার দলের স্বার্থ রক্ষায় লাঠিয়ালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখনও এতটা নষ্ট হয়ে যায়নি ছাত্র রাজনীতি। শিক্ষক রাজনীতিও ততটা দলীয় রাজনীতির আজ্ঞাবহ হয়ে ওঠেনি। আশির দশকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত সরকারগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় এর স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদায় তেমনভাবে আঘাত করেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়ই হয়েছে। ফলে সিনেটরদের মুক্ত ভোটেই প্যানেল নির্বাচিত হতো। সবাই চাইতেন মুক্ত মনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন। এই প্রক্রিয়ায় সরকারও তেমন একটা হস্তক্ষেপ করেনি। ফলে এই পর্বে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা প্রথিতযশা সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শিক্ষকদের ভিসি হিসেবে পাই। যাদের চিনিয়ে দেয়ার প্রয়োজন হতো না। নিজ গুণেই তারা পরিচিত ছিলেন। এমন বাস্তবতায় ক্যাম্পাসে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ কলুষিত হওয়ার তেমন সুযোগ ছিল না।

ধীরে ধীরে অবস্থা পাল্টাতে থাকে। ক্ষমতার রাজনীতি গ্রাস করে রাজনৈতিক দলগুলোকে। জাতীয় রাজনীতির দলীয় ঝগড়া ক্যাম্পাসেও ছড়িয়ে যায়। তা এতটা স্থূল হতে থাকে যে, মেধাবী মননশীল ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই নষ্ট বলয় থেকে বেরিয়ে আসে।

ক্ষমতার সুবিধা দিয়ে বিএনপি তার ছাত্রদল সাজিয়েছিল। তরুণ তুর্কিদের অস্ত্রসহ সব ধরনের শক্তিতে শক্তিমান করে তোলা হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরিতে একইভাবে সক্রিয় হয় ছাত্রলীগও। জিয়াউর রহমানের কল্যাণে আর আওয়ামী রাজনীতির ব্যর্থতায় এক সময় জামায়াত মাথাচাড়া দেয়। আরেক তরিকায় ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করতে থাকে ইসলামী ছাত্রশিবির। বীভৎস রগকাটা রাজনীতির জন্ম হয় এ দলের হাতে। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশের গ্রামগুলোতে নিজেদের প্রভাব বলয় তৈরি করে শিবির। সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ক্যাম্পাসকে রণক্ষেত্রে পরিণত করে।

ক্ষমতা দখলের পর এরশাদ নিজ দলের ছাত্র সংগঠন গড়েন ক্যাম্পাসে। কিন্তু তিনিও ব্যতিক্রম হতে পারেননি। একপর্যায়ে বেকায়দায় পড়ে এরশাদকে তার ছাত্র সংগঠন গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল।

> আমরা আশা করব, নতুন ছন্দে হাঁটতে চাওয়া সরকার নিজের আর পাঁচটা অতি জরুরি কর্তব্যের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং দেশের শিক্ষা পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে যথাযথ ভূমিকা পালন করে নিজ অভিভাবকত্ব বজায় রাখবে। আমরা স্বায়ত্তশাসনের মোড়কে যতই গণতন্ত্রের কথা বলি, আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে গোষ্ঠীতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা।

এ ধারার কলুষিত ছাত্র রাজনীতি হল দখলের রাজনীতিতে পরিণত হয়। দখলকারীর দাপট ছাত্র সংগঠনের নেতাদের অনেকটা পেশাজীবী চাঁদাবাজে পরিণত করে। তারা মদদ পায় জাতীয় দল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছ থেকে। চাঁদাবাজিতে এগিয়ে থাকে অর্থের নেশায় উন্মত্ত সরকারি দলের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা। তাই সংগঠনে অন্তর্কলহ বাড়তে থাকে। ছাত্র সংগঠনের হল কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের সময় এলে গ্রুপিং শুরু হয়। অস্ত্রের মহড়া চলে। মারামারি খুনোখুনির ঘটনা ঘটতে থাকে। এদের নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে পেলেপুষে রাখে রাজনৈতিক দলগুলো। প্রগতিশীল বাম ছাত্র সংগঠনের ছাত্রছাত্রীরা এক সময় মেধাচর্চা, নৈতিক মান ও আদর্শের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ছাত্রকল্যাণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলত। তাদের প্রতি সাধারণ ছাত্রদের সেই কারণে সমর্থনও ছিল। এখন আর সেই তেজ নেই। জাতীয় রাজনীতিতে বাম দলগুলো লাইনচ্যুত হয়ে যাওয়ার পর এর প্রভাব পড়ে ছাত্র সংগঠনেও। আগে বামদলের ছাত্ররা নিয়মিত পাঠ অনুশীলন করত। যুক্তিবুদ্ধি নিয়ে আন্দোলন শানাত। এখন অনেক ক্ষেত্রেই তারা নিজ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রায়ই ইস্যু খুঁজে বেড়ায়। জ্ঞান আর রাজনীতি অনুশীলন যথাযথ হয় না বলে এ ঘরানার ছাত্ররা যতটা তর্ক করতে পারেন, মূলধারার রাজনীতিতে ততটাই নিষ্প্রভ। এসব কারণে ছাত্র রাজনীতিতে সামগ্রিকভাবে একটি স্খলন দেখা দিয়েছে।

এই ছবি আজকের প্রসঙ্গে উপস্থাপন করা হল ক্যাম্পাস রাজনীতির বাস্তবতাটি বোঝানোর জন্য। রাজনৈতিক সুবিধাবাদী কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চায় এ দেশের সব মানুষ। আমাদের দেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ক্যাম্পাসকে শুভছন্দে ফিরিয়ে আনতে সরকারের ভূমিকাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সরকার পাল্টালে ক্যাম্পাস রাজনীতির ভোল পাল্টে যেতে থাকে। সরকারদলীয় ভিসির নেতৃত্বে প্রশাসন সজ্জিত হয়। ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে আসে সরকারদলীয়দের হাতে। সরকারদলীয় ছাত্রদের সঙ্গে অন্যপক্ষের সংঘাতের ঘটনা ঘটে। তবে বেশি ঘটে নিজেদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে। আন্তঃদলীয় দ্বন্দ্ব দানা বাঁধে সরকার সমর্থক শিক্ষকদের মধ্যেও। নানা পদ-পদবির লোভ এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।

এসব দ্বন্দ্বে বিরোধী শিবিরের সমর্থন আদায়ে করতে মরিয়া থাকে কোনো কোনো পক্ষ। ফলে নানা সুবিধাবাদী 'আন্দোলনের' প্রকাশ ঘটে। ব্যাহত হয় শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ। জনগণের টাকায় চলা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব অনাচার চলতে পারে দুটো প্রধান কারণে। একটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের পদলোভী মানসিকতার অশিক্ষকসুলভ আচরণ আর অন্যটি সংকীর্ণ রাজনৈতিক লাভালাভের কথা ভেবে সরকার পক্ষের নিষ্ক্রিয়তা। এই দুর্বলতার কারণে সরকার ক্রমাগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

এসব কারণে এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন-বিরোধী আন্দোলন নিয়মে পরিণত হয়ে পড়েছে। নিজেদের মধ্যে অবিবেচকের মতো ঝগড়াঝাটি করে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক শিক্ষকরা শুধু যে মেধার অপচয় করছেন তাই নয়, বিপন্ন করে তুলছেন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। আন্দোলনের নামে নিয়মনীতির ঝগড়ায় একপক্ষ অপেক্ষাকৃত বেশি দায়ী হতে পারে বৈকি। সেক্ষেত্রে সংকট নিরসনে নির্মোহ জায়গা থেকে সরকারের দ্রুত ভূমিকা রাখার কথা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকার সক্রিয় হতে অনেক বেশি সময় নিয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারপক্ষের দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তকে বাধাগ্রস্ত করে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির মতো প্রতিষ্ঠানও অনেক ক্ষেত্রেই পক্ষপাতিত্বের বাইরে থাকতে পারে না। এসব আচরণ ক্যাম্পাসের ভেতরকার সংকট সমাধান না করে একে আরও উসকে দেয়।

স্বায়ত্তশাসনের নামে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী বা খোদ ভিসি— কেউ স্বেচ্ছাচারী আচরণ করতে পারেন না। চাকরিবিধি মান্য করেই সবার চলার কথা। কিন্তু অধুনা নৈরাজ্য চলতে থাকলেও সরকারপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সরকারের এ ধারার আচরণ ক্যাম্পাসে সংকট সৃষ্টিকারীদের কাছে ভুল মেসেজ পৌঁছে দিচ্ছে। এরা বিশ্বাস করতে থাকেন আন্দোলনের নামে শিক্ষাজীবন যতটাই সংকটে ফেলুক না কেন, সরকার তাদের টিকিটিও ছুঁতে পারবে না। সরকারদলীয় সন্ত্রাসী ছাত্ররা বিশ্বাস করে, অস্ত্র উঁচিয়ে তাড়া করলেও তাদের সাত খুন মাফ হবে। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা যেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সরকারের নেই। সরকারপক্ষ যেন গা বাঁচিয়ে চলতেই বেশি আগ্রহী। এসব কারণে ক্যাম্পাসগুলো ক্রমাগত অশান্ত হচ্ছে। আর অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে সরকার। যৌক্তিক আন্দোলনগুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সবসময় পূরণ করতে পারছে না।

এমন অবস্থা থেকে দেশবাসী এখন মুক্তি চায়। এই মুক্তি পাওয়ার প্রধান উপায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর কর্তৃত্ব নয়— সরকারপক্ষের অভিভাবকত্ব বজায় রাখা। আমাদের মনে হয় সরকার অভিভাবকত্ব হারাচ্ছে এবং সংকট ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে কয়েকটি কারণে; ১. অতি রাজনীতিকরণের কারণে সরকার কাম্য দক্ষতা দেখাতে পারছে না, ২. সরকারের সংস্থাগুলো সঠিক ও নিরপেক্ষ তথ্য দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, ৩. সরকার ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে সঠিক আইন প্রয়োগে ব্যর্থ হচ্ছে, ৪. দলীয় বিবেচনা করতে গিয়ে শিক্ষক রাজনীতির অন্যায় দাপট ও সন্ত্রাসী দলীয় ছাত্রদের আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে, ৫. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে যেসব সংগঠন সরকারকে নানা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করে। এ প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো দায়িত্বশীল উচ্চপদস্থ ব্যক্তি নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যে কখনও কখনও বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতির কোনো একটি পক্ষের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠেন।

আমরা আশা করব, নতুন ছন্দে হাঁটতে চাওয়া সরকার নিজের আর পাঁচটা অতি জরুরি কর্তব্যের তালিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকটকেও অন্তর্ভুক্ত করবে এবং দেশের শিক্ষা পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে যথাযথ ভূমিকা পালন করে নিজ অভিভাবকত্ব বজায় রাখবে। আমরা স্বায়ত্তশাসনের মোড়কে যতই গণতন্ত্রের কথা বলি, আসলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চলছে গোষ্ঠীতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতা। নিজেদের কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শিক্ষকরা শিক্ষা ও গবেষণার পথ কণ্টকাকীর্ণ করে তুলতে কিছুমাত্র দ্বিধা করছেন না। এমন বাস্তবতার উঠোনে দাঁড়িয়ে আমরা সরকারপক্ষকে তাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। এ দেশের লাখ লাখ শিক্ষার্থী আর অভিভাবকের দিকে তাকিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সম্মান ফিরিয়ে আনা এবং সেগুলোকে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে অভিভাবকত্ব পালন করতে হবে সরকারকেই।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

shahnawaz7b@gmail.com

মহিউদ্দিন আহমদের আজকের নির্ধারিত লেখা প্রকাশিত হবে আগামীকাল। —স.স.